উদ্বোধনী ভাষণ

নীলিমা ইব্রাহিম

মাননীয় সভাপতি সাহেব, উপস্থিত সুধীজন ও আমার ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ।

বাংলা বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত অধ্যক্ষ মুনীর চৌধুরী, অধ্যাপক মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী এবং অধ্যাপক আনোয়ার পাশা বক্তৃতা মালার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে স্মরণ করছি সেই সব বরণীয় শিক্ষাবিদ এবং সাহিত্যিকদের যাঁদের শ্রম, যত্ন, ত্যাগ ও তিতিক্ষায় আজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ বর্তমান গৌরবজনক স্থানে উপনীত হয়েছে। বিভাগ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে প্রতি বৎসর এঁদের স্মরণে তাঁদের সাহিত্য কর্ম এবং জীবনাদর্শের আলোচনামূলক বক্তৃতা মালার আয়োজন করবে।

আজকের এই বিশেষ অনুষ্ঠানে নত মস্তকে, অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে স্মরণ করছি মুনীর চৌধুরী, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী এবং আনোয়ার পাশাকে যাঁদের নিয়ে ক'দিন আগেও বাংলা বিভাগে আমরা ছিলাম এক। যাঁদের মুখের কথা নিয়ে আমরা কথা বলেছি, যাঁদের ভালবাসা পেয়ে গর্ববোধ করেছি, যাঁদের দুঃখ ও বেদনায় নিজেরা ব্যথিত হয়েছি, আজ নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাসে তাঁরা দূরে চলে গেছেন। বাংলা বিভাগে আর তাঁদের পায়ের ছাপ পড়বেনা, তাঁদের কণ্ঠ থেকে জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য শুনবে না আর তাঁদের ছাত্ররা, স্নেহ-প্রীতির উচ্ছসিত আবেগে পূর্ণ হয়ে উঠবেন না আর বিভাগীয় অধ্যক্ষের কক্ষে অধ্যাপকবৃন্দ। অসময়ে আপন জন হারাবার বেদনায় আজ আমরা মূক। আজ কিছুক্ষণের জন্যে তাঁদের সান্নিধ্যকে ফিরে পাবার জন্যেই এ স্মৃতিচারণ। প্রতি বছর নবাগত ছাত্র ছাত্রীদের সামনে ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই, অধ্যক্ষ মুনীর চৌধুরী, অধ্যাপক মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, অধ্যাপক আনোয়ার পাশার পরিচিতি এমনি করেই বিভাগ তুলে ধরতে প্রয়াসী হবে। যাঁদের রক্তের বিনিময়ে স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে, বাংলা বিভাগের অধ্যাপকরূপে যাঁরা মাতৃ-ভাষার মান রাখতে গিয়ে মাতৃভূমিতে রক্তরঞ্জিত হয়ে আত্মদান করেছেন তাদের স্মৃতি অমরতা লাভ করুক এ কামনাই করি।

অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী সম্পর্কে কিছু বলতে গিয়ে মনে হয় মুনীরকে আমি দেখেছি সূর্যালোকে সূর্যকে দেখবার মতো। তার ভেতর দিয়েই তাকে চিনেছি। অমায়িক ব্যবহার, প্রাণোচ্ছল জীবন তরঙ্গ, নিরভিমান পাণ্ডিত্য, বন্ধুবাৎসল্য ও কৌতুকপ্রিয়তায় মুনীর আমাদের হৃদয়ের বড় কাছাকাছি ছিল। বিভাগে আমি তাঁর অধীনস্থ ছিলাম কিন্তু বড় বোনের সম্মান কতোটুকু পরিমাপ করতে পারিনি। মুনীর আমাকে যা দিয়েছেন তা আমার সহোদরের কাছ থেকে কখনও পাবো কিনা জানিনা।

বিগত ন'মাস দুশ্চিন্তাক্লিষ্ট দিনগুলো ভাবতে গেলে কপালে ঘন বড় বড় স্বেদবিন্দুসিক্ত একখানা ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত মুখ আমার চোখের সামনে ভাসে। সে মুখে ঘরছাড়া আত্মজের চিন্তা, কারাগারে অবরুদ্ধ ভাই ও ভ্রাতৃবধূর জন্য আশঙ্কা, তাদের শিশু সন্তানের জন্য উদ্বেগ, হাসপাতালে শয্যাশায়ী স্ত্রীর জন্য দুশ্চিন্তা আর তার অপর বিভাগীয় সহকর্মীদের নিরাপত্তা, কর্তৃপক্ষকে তুষ্ট রাখা ইত্যাদির কালো ছায়া বার বার সেখানে রেখাপাত করেছে। প্রতিদিন একটি প্রশ্ন ছিল আমাদের জন্যে, 'কালকের মতো আছেন তো?'

ডিসেম্বরের বার তারিখে আমাকে নির্দেশ দিলেন গৃহত্যাগের। দ্বিতীয়বার ফোন করে বল্লেন আমি যদি গুরুত্ব উপলব্ধি না করি তাহলে তিনি নিজে আসবেন। এই তাঁর শেষ উচ্চারিত স্নেহ কণ্ঠ। সে কণ্ঠ আজ চিরতরে মূক, আমাদের শ্রুতিশক্তির বাইরে।

মুনীর পণ্ডিত ছিলেন, ছিলেন অতিমাত্রায় তীক্ষ্ণধী। তাঁর মীর মানস, বাংলা-গদ্যরীতি, তুলনামূলক সমালোচনা, তাঁর প্রজ্ঞা ও পাণ্ডিত্যের সাক্ষ্য বহন করছে। সেখানে তিনি ধীর স্থির অধ্যাপক যাঁর উচ্চারিত শব্দমালা বৃহৎ শ্রেণীকক্ষকে মন্ত্রমুগ্ধ ভুজঙ্গের মতো শান্ত করে রেখেছে। সেখানে তাঁর সঙ্গে আমাদের সম্ভ্রমের ব্যবধান, শ্রেষ্ঠত্বের পার্থক্য।

নাট্যকার মুনীর চৌধুরী সকলের মুনীর ভাই। প্রচুর নাটক তিনি রচনা করেছেন, করতে চেয়েছিলেন আরও অনেক বেশী। রক্তাক্ত প্রান্তর, কবর, দণ্ডকারণ্য, দণ্ড, দণ্ডধর, চিঠি প্রভৃতির ভেতর নাট্যকারকে আমরা অনেক সহজে খুঁজে পাই। সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্প রহিত মানুষের বন্ধু, ব্যথিতের দরদী মুনীর চৌধুরী রচনা করেছেন রক্তাক্ত প্রান্তর। আর অফুরন্ত প্রাণধারায় হাস্য কৌতুকে মেতে মুনীর ভাই লিখেছেন চিঠি, দণ্ড, দণ্ডকারণ্য প্রভৃতি। দেশ সেবাব্রতী মুনীর রেখায়িত করেছেন 'কবর' নাটক।

একাধারে ইংরাজী ও বাংলা সাহিত্যে বুৎপত্তি থাকায় বেশ কয়েকখানা ইংরাজী নাটক তিনি অনুবাদ করেন এবং টেলিভিশনে সেগুলি সাফল্য অর্জনের

জন্য আরও নাটক অনুবাদ করতে শুরু করেছিলেন তিনি। গলস্ওয়ার্দীর সিলভার বক্স অবলম্বনে 'রুপার কৌটা' বার্ণাড্শ'-এর ইউ নেভার ক্যান টেল-এর অনুবাদ 'কেউ কিছু বলতে পারেনা' এবং সেক্স্পীয়রের টেমিং অব দি শ্রু অবলম্বনে টেলিভিশানের নাট্যরূপ 'মুখরা রমণী বশীকরণ' নাট্যকার মুনীর চৌধুরীর জন্য প্রচুর যশ আহরণ করেছিল। তাই তিনি সেক্সপীয়রের আরও কয়েকখানা নাটকে একসঙ্গে অনুবাদকের হাত প্রসারিত করেছিলেন।

সে সৃষ্টিশীল হাত আজ স্তব্ধগতি। ১৯৭১-এর ফেব্রুয়ারী মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শিক্ষক কেন্দ্রে তাঁর 'চিঠি' নাটক মঞ্চস্থ হয়েছিল। সেই নাট্যকারের প্রাণখোলা শেষ আনন্দ।

মুনীর নিজে অভিনেতাও ছিলেন। বেশী দিনের কথা নয় কৃষ্ণকুমারী নাটকে বলেন্দ্র সিংহের প্রাণবন্ত অভিনয় দেখেছি। শুনেছি ঢাকা বেতারে নোয়াখালির আঞ্চলিক ভাষায় সারেঙ্গ নাটকে কণ্ঠস্বর। তাঁর শিক্ষকতা পেশা না আটকালে হয়ত একদিন তাঁকে আমরা রূপালী পর্দাতেও দেখতাম। প্রচণ্ড প্রাণপ্রাচুর্য আর তীক্ষ্ণ ধীশক্তি তাঁকে সৃষ্টির এক অঙ্গন থেকে অন্য অঙ্গনে তাড়িত করেছে।

আজ শ্রদ্ধা জানাই অধ্যাপক, পণ্ডিত, নাট্যকার, ছোটগল্প লেখক, অভিনেতা মুনীর চৌধুরীকে আর অশ্রুবিন্দু উপহার দেই আমার সোদর প্রতিম মুনীরকে।

মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী

শান্ত, ভদ্র, বিনয়ী এবং পরিশীলিত রুচির কোনও ব্যক্তি সম্পর্কে চিন্তা করতে গেলে অধ্যাপক মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরীর কথাই বিশেষভাবে মনে পড়ে। নিজের স্বভাবসুলভ কমনীয় আচরণে তিনি ছিলেন সবার প্রিয়। অজাতশত্রু অধ্যাপক চৌধুরী এমন নির্মমভাবে নিহত হবেন একথা কেউ কখনও ভাবতে পারেনি।

মোফাজ্জল হায়দার ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র। প্রবেশিকা থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রী লাভ পর্যন্ত সর্বত্রই তিনি সম কৃতিত্বের দাবীদার। কিন্তু তাই বলে পাণ্ডিত্যের অভিমান বা অহঙ্কার তাঁর ছিল না।

ব্যক্তিগত জীবনে অধ্যাপক চৌধুরীর সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য ছিল তাঁর পরোপচিকীর্ষা। কেউ কোথায়ও বিপদে পড়লে একবার খবর পেলেই হ'তো, আহ্বান জানাবার আবশ্যক ছিল না। বিগত সংগ্রাম চলাকালে বিভাগীয় অধ্যাপক

রফিকুল ইসলাম যখন কারারুদ্ধ হ'লেন তখন তাঁকে মুক্ত করবার জন্য চৌধুরী সাহেবের কোনও এক উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন আত্মীয়ের কাছে তিনি বার বার গেছেন। তৎকালীন গভর্ণরের কোনও এক আত্মীয়ের কাছে তাঁকে অনেকবার বলতে শুনেছি 'রফিক তোমার শিক্ষক, তোমার উচিত তোমার চাচাকে গিয়ে সব বলা এবং ওর মুক্তির ব্যবস্থা করা।' এসময়ে ধৃত অধ্যাপকদের মুক্তি প্রচেষ্টায় তাঁর ব্যক্তিগত শ্রম ও আয়াসের কথা অনেকেই জানেন।

মোফাজ্জল হায়দার যখন গাড়ী চালিয়ে যেতেন তখন তার কোনও পরিচিত ব্যক্তির পক্ষে তাঁর সামনে দিয়ে হেঁটে যাওয়া সম্ভবপর ছিল না। তাই গাড়ীতে কখনও তাঁকে একা দেখিনি। বহু ছাত্রছাত্রীকে অবলীলাক্রমে সঙ্গী করে তাদের গন্তব্য স্থানে পৌঁছে দেবার দায়িত্ব তিনি হাসিমুখে বহন করেছেন।

মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী ছিলেন কবিমনা সৌন্দর্য সচেতন স্বভাবের ব্যক্তি। ফুল বড্ড বেশী ভালবাসতেন। গত শরতেও রুমাল ভরে শিউলী ফুল এনে বিভাগীয় প্রধানের টেবিলে আমাদের সবাইকে ঢেলে দিয়েছেন।

বেশ কয়েক বছর আগেকার একটা কাহিনী মনে পড়ছে। অধ্যাপক চৌধুরী আজিমপুরে সরকারী বাড়িতে এক তলার ফ্ল্যাটে থাকতেন। আমরা মাঝে মাঝে ওঁর ওখানে যেতাম। ওঁর স্ত্রী বেশ কিছুদিন ধরে অসুস্থ ছিলেন। ডঃ ইব্রাহিম তাঁকে বাড়ির সামনের গাছটা কাটাতে বলেছিলেন। তাঁর মতে রোদের অভাবেই মিসেস হায়দার অসুখে ভুগছিলেন। অধ্যাপক চৌধুরী একটু চুপ করে থেকে বল্লেন, 'ডাক্তার সাহেব বাড়ীটাই বদলে ফেলি কারণ শিরীষের ডালে আমি আঘাত করতে পারবো না।' সেখানে অধ্যাপক অজিত গুহও উপস্থিত ছিলেন। ডাক্তার অসন্তুষ্ট হলেন, কিন্তু আমরা একটি সৌন্দর্যপিপাসু নিসর্গ সচেতন মনের পরিচয় সেদিন পেয়েছিলাম।

আজ বার বার নানা ব্যক্তিগত ঘটনাই আমার চিন্তার জগতকে আচ্ছন্ন করছে। যদি সময় পাই হয়ত সেদিন শোকবিহ্বলতা মুক্ত হয়ে তাঁর সামগ্রিক পরিচয় দিতে চেষ্টা করবো।

শান্তি নিকেতনের ছাত্র অধ্যাপক চৌধুরী ছিলেন নিষ্ঠাবান রবীন্দ্র ভক্ত। তাই পাকিস্তানের রবীন্দ্র বিরোধীদের সঙ্গে বার বার নানা ভাবে তাঁকে সংগ্রামে জড়িয়ে পড়তে হয়েছে। তর্ক বিতর্ক করেছেন সবার সঙ্গে, হার স্বীকার করেন নি। আপোষের প্রশ্নও সেখানে ছিলনা।

সৃজনী সাহিত্য ক্ষেত্রে তাঁর 'রবি পরিক্রমা' গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত রবীন্দ্র সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধগুলিকে এ গ্রন্থে একত্র সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

'সাহিত্যের নব রূপায়ণ' গ্রন্থে বঙ্গ সাহিত্যের বিভিন্ন লেখকের সাহিত্য কর্ম সম্পর্কে সমালোচনা রয়েছে।

'রঙ্গীন আখরে' ব্যক্তিগত প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। এছাড়া ভাষা সম্পর্কিত তাঁর বহু আলোচনা রয়েছে। বিদেশীদের বাংলা শেখানোর আগ্রহে তাঁর 'কলু-ক্যাল বেঙ্গলী' গ্রন্থ রচিত হয়। স্বদেশ সেবার মানসিকতা নিয়ে তিনি দীর্ঘকাল বাংলা একাডেমীতে অবাঙ্গালীকে বাংলা শিখিয়েছেন।

অধ্যাপক চৌধুরীর পাণ্ডিত্যের তুলনায় তাঁর প্রকাশনা কম। হয়ত যে জীবনে তিনি সাহিত্য সাধনায় ও আত্মপ্রকাশে নিজেকে নিয়োজিত রাখতেন বিধাতা তাঁকে সে অবকাশের জীবন দিলেন না।

মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরীর সাহিত্য সমালোচনাতেও তাঁর ব্যক্তিগত মেজাজ পরিলক্ষিত হয়। সমালোচনায় তিনি সর্বত্র দরদী, তীক্ষ্ণ বিরূপ মন্তব্য তাঁর লেখনীতে আমরা খুঁজে পাইনা।

ছাত্র বৎসল অধ্যাপক মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরীকে আমরা হারিয়েছি। তাঁর ছাত্র-ছাত্রী, সহকর্মী, ও গুণমুগ্ধ সুহৃদদের মাঝে তাঁর মৃত্যু নেই। সেখানে তাঁর স্মৃতি চির ভাস্বর, বাংলাদেশের সাহিত্য ও সংগ্রামের ক্ষেত্রে রবীন্দ্র ভক্ত ও সাধক অধ্যাপক চৌধুরী স্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে থাকবেন এ ধ্রুব সত্যকে আমরা গ্রহণ করলাম।

আনোয়ার পাশা

অধ্যাপক আনোয়ার পাশার সঙ্গে আমার পরিচয় দীর্ঘকালের নয়। কিন্তু অল্পদিনের ভেতর নিজের অহমিকাশূন্য স্বভাবে তিনি আমাদের হৃদয় জয় করে-ছিলেন। আনোয়ার পাশার উজ্জ্বল এবং গভীর চোখের দৃষ্টিতে আকৃষ্ট হয়েছে তাঁর কাছের সবাই।

বিগত সংগ্রামের ন'মাসে আমরা পরস্পরের নিবিড় সান্নিধ্যে এসেছিলাম। বিভাগে কাছাকাছি বসে অনুচ্চকণ্ঠে মুক্তিবাহিনীর ক্রিয়াকলাপ আলোচনা করা এবং তাদের যোগসূত্রে নানারকম কাজে সহায়তা করতে গিয়ে আনোয়ার পাশাকে অতি কাছে পেয়েছিলাম। রোজ একবার বলতেন 'আর নয়, আপা, এবারে চলে যাবো। চলুন না আপনিও আমার সঙ্গে, আপনাকে কয়েক বছর খাওয়াবার মতো সামর্থ্য আমাদের আছে।' কিন্তু শেষ পর্যন্ত খাওয়া আর হয়নি। গত ১০ই ডিসেম্বর তাঁর সঙ্গে আমার শেষ দেখা। বলেছিলেন, 'আমি অতি সাধারণ

ব্যক্তি। আমাকে কে কি করবে। প্রাণ দিয়ে আনোয়ার পাশা প্রমাণ করে গেছেন তিনি অতি সাধারণ ব্যক্তি ন'ন, দেশপ্রেমে, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের একনিষ্ঠ সেবায় তিনি ছিলেন অসাধারণ।

আনোয়ার পাশা কবিতা লিখতেন, দুর্যোগের ভেতর একটা বাংলা টাইপ রাইটার কিনেছিলেন তিনি। কবিতা টাইপ করে এনে আমাদের দেখাতেন। একদিন বিরক্ত হয়ে বল্লাম, 'এর ভেতরও আপনার কবিতা লেখা আসে।' হেসে বল্লেন, 'কি যে বলেন আপা আপনাকে কি রোজ কবিতা দেখাই নাকি আমার টাইপ বিদ্যা কতোদূর এগুলো তাই দেখাই।'

হারিয়ে গেছে সেই সহজ, সরল, বিনয়ী মিষ্ট হাসি মুখের সুহৃদ এবং সহ-কর্মী। চেহারা দেখে মনে হ'ত তরুণ। তাই ক্লাসে ঢুকে বছরের প্রথম দিন বলে নিতেন, 'আমার বয়েস কিন্তু অনেক, আমাকে ছেলে মানুষ মনে করোনা।' এমন মানুষের ওপরেও পাকিস্তানী ঘাতকের অস্ত্র উদ্যত হয়েছিল। অপরাধ তিনি তাঁর জননীকে প্রাপ্য সম্মান দিতে চেয়েছিলেন।

স্বল্পকালীন সাহিত্য সাধনায় আনোয়ার পাশা অনেক পরিশ্রমের চিহ্ন রেখে গেছেন। তাঁর প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'নদী নিঃশেষিত হলে'। এ কাব্য গ্রন্থে কবি আশাবাদী, জীবন তাঁর কাছে অর্থপূর্ণ, শান্তির নীড়।

দু'খানা উপন্যাস আনোয়ার পাশা রচনা করেছেন 'নীড় সন্ধানী' এবং 'নিশুতি রাতের গাথা'। আনোয়ার পাশা পশ্চিম বঙ্গে জন্মেছিলেন। তাঁর পরিচিত পারিপার্শ্বিক এ উপন্যাস দু'খানার পটভূমিকা।

'রবীন্দ্র ছোটগল্প সমীক্ষা' আনোয়ার পাশার সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। এখানে সমালোচক অধ্যাপককেই শুধু আমরা পাইনি একজন নিষ্ঠাবান রবীন্দ্র সাহিত্য সাধককেও পেয়েছি। হয়ত এই রবীন্দ্র সাধনার পুরস্কার তাঁর অকাল মৃত্যু।

এছাড়া মরহুম অধ্যাপক আবদুল হাই সাহেবের সঙ্গে যুক্তভাবে তিনি কয়েক খানা গ্রন্থ সম্পাদনা করেন, এগুলির ভেতর চর্যাপদ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, কালকেতু উপাখ্যান, মানসিংহ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

আনোয়ার পাশার সাহিত্যকর্ম তাঁকে বাঙ্গালী পাঠক সমাজে চিরঞ্জীব করে রাখবে।

বন্ধু ও ছাত্রপ্রিয় অধ্যাপক আনোয়ার পাশার মৃত্যুতে শোক প্রকাশের ভাষা আমাদের নেই। অল্প দিনে সবার অন্তর জয় করে তিনি আমাদের জন্যে এক বুক শূন্যতা রেখে গেছেন।

সর্বশেষে উল্লেখ করছি আমাদের এ বক্তৃতামালায় সর্ব মোট ছ'টি বক্তৃতা অনুষ্ঠিত হবে। প্রত্যেক শহীদ অধ্যাপকের জীবনী ও সাহিত্যকর্ম সম্পর্কিত

দু'টি করে আলোচনা নিয়ে মোট ছ'টি বক্তৃতার আয়োজন আমরা করেছি।

অবশ্য এ আলোচনায় যাঁরা অংশ গ্রহণ করছেন তারা এখনও সদ্য শোকে কাতর তাই হয়ত বক্তব্যে আবেগপ্রবণতা বেশী থাকতে পারে। কারণ কোনও লেখক বা সাহিত্যিকের সৃষ্টির মূল্যায়ন করতে হলে যে সময়ের ব্যবধান প্রয়োজন সে সময় পেতে আমাদের দীর্ঘদিন লাগবে। তাই এ আলোচনায় ব্যক্তিগত পরিচয়ের ছাপ অধিক থাকাই সম্ভব।

এ বক্তৃতা মালায় যাঁরা পৌরহিত্য করছেন, যাঁরা প্রবন্ধ পাঠ করছেন, যারা আলোচনায় অংশ গ্রহণ করছেন এবং যাঁরা উপস্থিত থেকে আমাদের মর্মবেদনার অংশীদার হয়েছেন তাদের সবাইকে আমি আমার এবং বিভাগীয় অধ্যাপক অধ্যাপিকা ও ছাত্র-ছাত্রীদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আশা করি ভবিষ্যতে আপনাদের সবার কাছ থেকে এ ধরনের সহৃদয় সহানুভূতি লাভে আমরা বঞ্চিত হবো না।

ভাষণ

আহমদ হোসেন

ডঃ শহীদুল্লাহ, মুহম্মদ আবদুল হাই ও মুনীর চৌধুরী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগে যে ঐতিহ্য সৃষ্টি করে গেছেন, তা সকলের জানা। ভাষা আন্দোলন ও পরবর্তী আন্দোলনে বাংলা বিভাগের যে ঐতিহ্য সেটা ছাড়া পরবর্তী কালে এই আন্দোলন স্বাধীনতা আন্দোলনের পথে অগ্রসর হত কিনা সন্দেহ। মুনীর চৌধুরী এ আন্দোলনের প্রধান নেতা। বাংলা বিভাগের অধ্যাপকেরা যদি সামান্যতম আপোষের মনোভাব গ্রহণ করতেন তাহলে বাংলাদেশের ইতিহাস ভিন্নভাবে লেখা হতো। বিভিন্ন কলেজ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাংলা বিভাগের শিক্ষকেরা যে ভূমিকা পালন করেছেন তার পশ্চাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের প্রভাব বিরাট। মুনীর চৌধুরী আমার ভ্রাতৃপ্রতিম বন্ধু, মোফাজ্জল হায়দার চৌদুরী ভাইয়ের মতো, আর আনোয়ার পাশা আমার ছাত্র। তাদের অবর্তমানে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে তা অপূরণীয়। এ তিনজনই ছিলেন আপোষহীন মনোভাবের অধিকারী। আমরা যদি এই আপোষহীন মনোভাব নিয়ে আদর্শ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অগ্রসর হই তবেই তাদের প্রতি যথার্থ সম্মান প্রদর্শন করা হবে। এঁরা ছিলেন নির্লোভ। সুবিধাবাদী ছিলেন না এঁরা। আমাদেরও উচিত লোভ এবং সুবিধাবাদ পরিহার করে চলা।

ভাষণ

কবীর চৌধুরী

যাঁদের হারিয়েছি তাদের সম্পর্কে আলোচনা ও স্মৃতিসভা আমাদের ভবিষ্যৎ অগ্রগতির সহায়ক হবে। যাঁরা আজ আমাদের মধ্যে নেই তাঁরা ছিলেন নির্লোভ। এদের আদর্শই ভবিষ্যতে বুদ্ধিজীবীদের আদর্শের পথে এগিয়ে দেবে। সব বুদ্ধিজীবী প্রগতিশীল ভূমিকা পালন করে না। যাঁরা প্রগতিশীল তারাই আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র। আগামী দিনের সংগ্রাম শোষণমুক্ত প্রকৃত স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করার সংগ্রাম। যাদের হারিয়েছি তাঁরা ছিলেন ত্যাগী ও নিঃস্বার্থ তাদের এই আদর্শ যেন আমাদের উদ্বুদ্ধ করে।

ভাষণ

সৈয়দ আলী আহসান

আমরা পৃথিবীতে কি চাই? আমরা সজীবতা চাই। আলো চাই, প্রাণ-চাঞ্চল্য চাই। কবি সাহিত্যিকেরাই পৃথিবীতে এই সচলতা সজীবতা আনয়ন করে। যে তিন জনের কথা আলোচনা করছি তাঁরা সবাই সাহিত্যিক ছিলেন-তাঁরা এই আলো ও সচলতা আনতে চেয়েছিলেন, আনতে চেয়েছিলেন জীবনানন্দ। তাদের সম্পর্কে আলোচনা করে আমরাই উপকৃত হব। বাংলা বিভাগকে এই আলোচনা সভা আয়োজন করার জন্য ধন্যবাদ।

প্রধান অতিথির ভাষণ

শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক ইউসুফ আলী

স্বাধীনতা আন্দোলনে বুদ্ধিজীবীদের একটা বলিষ্ঠ ভূমিকা থাকে। এ ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের বুদ্ধিজীবীরা সে ভূমিকা যথাযথ পালন করেছেন। এদেশে জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষে বুদ্ধিজীবীরা যথেষ্ট অবদান রেখেছেন। তবে এর যে ব্যতিক্রম ছিল না তা নয়। অনেক বুদ্ধিজীবী পদমর্যাদা, লোভ ও মোহে পড়ে প্রতিক্রিয়ার কাছে নিজেদের বন্ধক রেখেছিল। এতে আমরা দুঃখ পেয়েছি অনেক, আমি কামনা করবো এর যেন পুনরাবৃত্তি আর না হয়। যারা সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশ-বাদের দালালী করবে তাদের প্রতিরোধ করা হবে। যাদের আমরা হারিয়েছি, আজ তাদের প্রয়োজন ছিল খুব বেশী। এখন আশা করবো আমাদের বুদ্ধিজীবীরা

আমাদের পরিচালিত করবেন যাতে আমরা লক্ষ্যভ্রষ্ট না হই কিংবা স্তিমিত হয়ে না পড়ি।

সাধারণ মানুষ দেশের কাছ থেকে অনেক কিছু আশা করে। আশা ভঙ্গ হলে বিক্ষোভ ও বিস্ফোরণ হতে পারে। কামনা করি দেশে যেন আর রক্তপাত না ঘটে। আগামী দিনের সংগ্রামে যেন আমাদের অতীত শিক্ষা কাজে লাগে। বুদ্ধিজীবীসমাজ যেন শহীদ বুদ্ধিজীবীদের কথা স্মরণ করেন। তাদের মনে রাখতে হবে আমাদের প্রয়োজনে, জাতির প্রয়োজনে।

বাংলা বিভাগকে এই আয়োজনের জন্য ধন্যবাদ জানাই। শহীদদের আদর্শকে আমরা ধরে রাখব—এটাই আমাদের আজকের শপথ হোক।

সভাপতির ভাষণ

মযহারুল ইসলাম

মুনীর চৌধুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে স্বাধীন বাংলাদেশে আমি সবচেয়ে বেশি খুশী হতাম। মুনীর চৌধুরী ও মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী আমার সহকর্মী। আনোয়ার পাশা পশ্চিমবঙ্গ থেকে আসার পর আমি তাকে পাবনা এডওয়ার্ড কলেজে অধ্যাপনা করার সুবিধা করে দিই।

এই তিন মনীষী বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে অনন্য ব্যক্তি ছিলেন। সব প্রতিকূলতার মধ্যেও তাঁরা তাদের লেখা, বক্তৃতার মাধ্যমে আমাদের স্বকীয়তা বাঁচিয়ে রাখতে সাহায্য করেছিলেন। ভাষা আন্দোলনের ক্ষেত্রে মুনীর চৌধুরীর অবদান অতুলনীয়। বাংলা বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত এ বক্তৃতামালার সাফল্য কামনা করছি।